রম্য

মহেন্দ্রনাথ দত্তের চোখে সেকালের বিলিতি খানা

সুদীপ বসু

সিমলের বিশ্বনাথ দত্তের তিন পুত্রসন্তানের প্রথম নরেন্দ্রনাথ সরস কলমের অধিকারী ছিলেন। তৃতীয় ভূপেন্দ্রনাথ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, বিশেষ রাজনৈতিক মত এবং সমাজতাত্ত্বিক ধারণায় গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাই তাঁর লেখালিখি সিরিয়াস টাইপের। কিন্তু বিশ্বনাথ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। বেশ কয়েকটি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। সেসবের মধ্যে সাহিত্যরস বিলক্ষণ চোখে পড়ে। অথচ সাহিত্যিক মহেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি! কয়েক বছর আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের অসাড় মনকে নাড়া দেওয়ার জন্যে মহেন্দ্রনাথকে নিয়ে 'বৈঠকি মেজাজের উপেক্ষিত সাহিত্যিক' নামে চমৎকার লিখেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ অবশ্য তারপরেও বিস্মৃতির আঁধারে রয়ে গেছেন। কিন্তু এমন নির্ভেজাল উপেক্ষা সত্যিই কি তাঁর প্রাপ্য?

১৮৯৬-তে আমেরিকা থেকে লন্ডনে আগত বিবেকানন্দের সঙ্গে ক্ষিপ্রলিপিকার হিসেবে জে জে গুডউইন ছিলেন। আরও ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। স্বামীজীর আহ্বানে টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শেখার জন্য মহেন্দ্রনাথ ওই সময়েই লন্ডনে হাজির হন। বিশ্ববিখ্যাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার খুব কাছে থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এও বুঝেছিলেন যে, ''পূর্বতন নরেন্দ্রনাথ আর নয়; পূর্বদেহে বিবেকানন্দ নামক এক মহাশক্তি প্রবেশ করিয়াছে। এক দেহের ভিতর কখনও বা কলিকাতার নরেন্দ্রনাথ বাস করেন, কখনও বা বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ বাস করেন। ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, হাত-নাড়া, আঙ্গুল-নাড়া স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে।" এহেন মহাশক্তির প্রতি সভক্তি সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা মহেন্দ্রনাথের ছিলই।

সুতরাং মহেন্দ্রনাথের 'লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' বইটির আগাপাশতলা জড়িয়ে আছেন বিবেকানন্দ। গ্রন্থের 'প্রাগ্‌বাণী'তে মহেন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, গুডউইনের অকালপ্রয়াণে তাঁর কাছে ক্ষিপ্রলিপিতে গৃহীত বিবেকানন্দের বক্তৃতার প্রচুর নোট নষ্ট হয়ে যায়। সেই অভাবপূরণের তাগিদে ''বহু লোকের অনুরোধে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রয়াসী হই।" সেই গুরুদায়িত্ব বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে তিনি সামলেছেন। সবিনয়ে বলেছেন, লন্ডনে স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়ে ''আমার যতদূর স্মরণ আছে... সেইসকল বিষয় কিঞ্চিৎ আভাষস্বরূপ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল, ইহাতে আমার নিজের মত বা ভাব কিছুই সন্নিবেশিত হয়

নাই।... এই গ্রন্থপাঠে যদি কাহারও কিছু উপকার হয় এবং স্বামীজীর বিষয় কেহ বিশেষভাবে বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব এবং আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।"

মহেন্দ্রনাথের শ্রম নিশ্চয়ই সার্থক হয়েছে। কিন্তু এও সত্য যে 'লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' বইটিতে নিজের সাহিত্যিক সত্তাকে তিনি গোপন করতে পারেননি। সে-ইচ্ছা তাঁর ছিল কি না সন্দেহ। কারণ বিবেকানন্দের বক্তৃতার ধারাবাহিক বর্ণনার মাঝে তাঁর কলম কেন সরস হয়ে উঠল, খানিকটা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে সেকথা জানিয়েছেন :

''ভারতবাসীরা বিদেশের যাহা কিছু গল্প পান, অধিকাংশ স্থলে কাটা-ছাঁটা শুষ্ক কয়েকটি ভাব মাত্র, কিন্তু সেখানকার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি অনেকের জানিতে কৌতূহল হইয়া থাকে। এ স্থলে যদিও গল্পগুলি অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু মাঝেমাঝে হাসি-তামাশা না দিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে এইজন্য স্থানে স্থানে নানারকম উপাখ্যান প্রদত্ত হইল।"

'লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' পড়তে পড়তে মনে হয় ভাগ্যিস মহেন্দ্রনাথ এই কাজটি করেছিলেন! সেকালের লন্ডন শহর ও শহরতলির মানুষজন, তাদের আদবকায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পান-ভোজনের চিত্ররূপময় বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে। [বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে অনেকটা একই জাতীয় বর্ণনা আমরা পেয়েছি এবং সন্দেহ নেই সেসবের দ্বারা মহেন্দ্রনাথ প্রভাবিত ছিলেন, যদিও দুই ভাইয়ের গল্প বলার পদ্ধতি ভিন্ন]। তবে বর্তমান লেখায় বিলিতি খাদ্য-অখাদ্যর কথাই কেবল আনব।

পথচলতি খাবারের দোকান থেকে প্রথম শ্রেণির দোকান—কিছুই মহেন্দ্রনাথের চোখ এড়িয়ে যায়নি। মাছভক্ত বাঙালি তিনি—তার ওপর উত্তর কলকাতার ঘটি। কাজেই রাস্তার ধারে গলদা চিংড়ি কুঁচো চিংড়ি খাবার দোকান চোখে পড়েছে। তার ভেতরে উঁকি দিয়ে নিজে দেখলেন আর আমাদেরও দেখাতে লাগলেন 'সুসইভ্য' ইংরেজদের চিংড়িআহার—''Oyster-এর খোসার মাঝখানে সাদাতে-হলদেতে মিশানো হড়হড়ে নালের মত একপ্রকার শাঁস হয়, [এদেশের লোকে] সেই হড়হড়ে নালের শাঁসটা চামচে দিয়া সুরুৎ সুরুৎ করিয়া খাইতে থাকে।" মহেন্দ্রনাথের টিপ্পনি, ইংরেজদের কাছে এমন কাঁচা চিংড়ি 'পরম উপাদেয়'। হায় হায়, চিংড়ির অমন সুস্বাদু মালাইকারির বদলে কিনা কাঁচা চিংড়ি ইংরেজদের মুখে রুচল! মহেন্দ্রনাথ নির্ঘাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। দীর্ঘশ্বাসের আরও কারণ, মাছের ডিম খেলে বিলিতি মানুষের বমন অনিবার্য যা আবার আমাদের পাতে পড়তে পায় না। তবে ছোট গুগলি সিদ্ধ তাঁরা পরমানন্দে ভোজন করেন যদিচ সেসব ''আটদশ দিনের পুরাতন বা বাসিও হইতে পারে।... স্ত্রীলোকেরা অনেক সময় মাথার পিন দিয়া ভিতরকার শক্ত শাঁসটা বাহির করিয়া খাইয়া থাকে।" অর্থাৎ কাঁচা, বাসি [তৎসহ পচা] খাবারে ইংরেজদের বেশ রুচি। তবে পরিবেশনের কায়দা খুব—দিব্যি সাজিয়েগুছিয়ে সেসব হাজির করা হয়। [বিলিতি খাবার কীভাবে রান্না করা হয় আর কী তার পরিবেশন পদ্ধতি, তা মনোরম ব্যঙ্গের খোঁচায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বিবেকানন্দ লিখেছেন।] মহেন্দ্রনাথ এই সুযোগে দেশি লোকেদের নতুন ব্যবসা বাতলে দিলেন, ''যদি হুগলির কোন লোক লন্ডনে গিয়া গুগলির ব্যবসা করে তাহলে বেশ ব্যবসা চলিবে।" এরপর বিলিতি গলদা চিংড়ি-কুঁচো চিংড়ির আকারপ্রকারের খবর শুনিয়েছেন।

রাস্তার ধারের দোকান পেরিয়ে প্রথম শ্রেণির দোকানে কফিপান—মহেন্দ্রনাথ নিজেই একবার সেখানে গিয়েছিলেন। দারুণ রাজকীয় ব্যবস্থা—

পায়ের নিচে মখমল বিছানো নরম গালচে, দেয়ালজোড়া আরশি, মখমলমোড়া স্প্রিংয়ের চেয়ার, মার্বেল পাথরের টেবিল, তার পায়াগুলি মেহগনি কাঠের ঝকঝকে পালিশ করা, রুপোর বাসনপত্র—ভারতীয়দের কাছে ভোগবিলাসের চূড়ান্ত।

অবশেষে কফি এল টেবিলে—''একটা ডিমের ন্যায় ছোট বাটিতে করে চিকরি মিশানো কাফি দিলে, সঙ্গে ফুল-কাটা একটু করিয়া মাখন, ছোট একখানি Roll বা মচমচে পাউরুটি।'' এই তো কফির ছিরি, দাম অবিশ্যি আকাশছোঁয়া। মহেন্দ্রনাথের সঙ্গী ''মেনন মাদ্রাজী, কাফি খাওয়ার জাত, তার ঠোঁট ভিজিল না; গজগজ করিয়া বকিতে লাগিল।'' মহেন্দ্রনাথ মনে মনে হেসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, ''ওহে বাবু, চট কেন? কালা আদমী ঘরে ঢুকতে দিয়েছে এই যথেষ্ট। ঘরটার ব্যাপার কি দেখে যাচ্ছ এইজন্য আক্কেলসেলামি দিলে।'' এই সূত্রে সাধারণ ইংরেজ গৃহস্থবাড়িতে কফিপানের ব্যবস্থা, ফরাসি তুর্কি আরবদের কফিপানের কথাও আছে।

কফি ছাড়াও চা-পান—মোটামুটি ব্যাপারস্যাপার ওই কফিপানের মতোই। একদিনের চা-পানের বর্ণনা এইরকম—

''বাটীতে একজন বুড়ি ঝি বা হাউস কিপার ছিল সে চা লইয়া আসিল। একটা টি-পট করিয়া চা, একটি ছোট জাগ্-এ করিয়া কাঁচা দুধ, পিচবোর্ডের মতো পাতলা পাতলা মাখন দেওয়া পাউরুটি-কাটা ও লাম্প শুগার। আর একটা বড় জাগ্-এ গরম জল থাকে; যিনি পাতলা চা খান, তাঁহাকে গরম জল দেয়।... লাম্প শুগার লইবার প্রথা হইতেছে যে, একটি জার্মান-সিলভারের বা ঐরূপ কোন সাদা ধাতুর বাহারি চিমটার দুই দিক্‌টা ডগাতে সরু সরু আঙ্গুলের মতো কাঁটা দেওয়া আছে—চিনির টুকরো সেই কাঁটা দিয়া টিপিয়া ধরিয়া ইচ্ছামত চায়ের বাটিতে দিতে হয়। হাত দিয়া চিনি তুলিয়া লওয়া নিষিদ্ধ।''

এক কাপ চা পান করতে গেলে এত আদবকায়দা মেনে চলতে হবে নাকি? কিন্তু যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ! এর পরেই দেখব বিপত্তারণ মধুসূদনের ভূমিকায় স্বয়ং বিবেকানন্দ আবির্ভূত। চা-পান কীভাবে করতে হয় তা তিনি শিখিয়েছিলেন কি না জানি না, তবে টেবিলে বসে কেতা মেনে কীভাবে আহার করতে হয়, তা তিনি হাতেনাতে সারদানন্দ স্বামীকে শেখালেন। তাঁর পাশে বসে বুঝে নিলেন মহেন্দ্রনাথ।

সুপের বাটি থেকে কাঁটাচামচ ধরা—বিলিতি ভোজনের নিয়মকানুন নিয়ে বিবেকানন্দের ভাষ্য : ''ওরে শরৎ, ওরকম করে [সুপের বাটি] ধরে না। আমি যেভাবে করছি সে-রকম কর্।'' পাঠকের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করার জন্য মহেন্দ্রনাথ টীকা যোগ করলেন : ''অর্থাৎ প্লেট অপরদিকে বেঁকিয়ে ধরিতে হয়, সম্মুখের দিকটা উঁচু করিলে মাথার দিকটায় সব তলার জিনিস জমা হয়। চামচেটা তলার দিক থেকে হেলাইয়া সুপটা লইতে হয় এবং মুখে দেবার সময় চামচের পাশ দিয়া লইতে নাই, ডগার দিক দিয়া লইতে হয়।'' সুপের বাটি ধরা শেষ করে যখন খাবারের থালা এল তখন তার সহবত অন্যরকম। পুনশ্চ বিবেকানন্দ উবাচ—''ওরে ডান হাতে [কাঁটা] ধরতে নেই, ডান হাতে ছুরি ধরতে হয়, আর বাঁ হাতে কাঁটা দিয়ে মুখে তুলতে হয়। অত বড় বড় গরস করে না, ছোট ছোট গরস করবি। খাবার সময় দাঁত জিভ বার করতে নেই, কখনও কাশবি না, ধীরে ধীরে চিবুবি। খাবার সময় বিষম খাওয়া বড় দূষণীয়, আর নাক ফোঁস ফোঁস কখনও করবে না।'' মহেন্দ্রনাথের সরস মন্তব্য, ''এসব হচ্ছে তালিম প্যারেড, যেন থিয়েটারে প্রম্পটিং করা হচ্ছে।''

এদিকে বিলিতি কেতা শিখতে গিয়ে সারদানন্দ

মহা বিপদে পড়ে গেলেন। তার ওপর তাঁকে সেদিন খেতে হয়েছে নোনা দুধে সেদ্ধ মোটামোটা ম্যাকরনির সুপ। প্রায় উগ্‌রে দেওয়ার অবস্থা। [মহেন্দ্রনাথের তির্যক উক্তি : ''সারদানন্দ স্বামী দু'এক চামচ খাইয়া মুখ বিটকেল করিয়া ন্যাকার করিবার মতো করিলেন।''] কোনওরকমে খাওয়া সাঙ্গ করে ছদ্ম দুঃখে সারদানন্দ বলতে লাগলেন, ''কোথায় হাতে করে বড় বড় থাবা করে খাব, না একটু একটু করে ছুঁচ বিঁধে খাওয়া! আর দ্যাখ দেখি, হিন্দুর ছেলে দুধে নুন দিয়ে খাওয়া? আরে খেয়ে আমার পেট গুলিয়ে উঠলো, কিন্তু [নরেনের] ভয়ে বমি করতে পারলুম না। তখন উঠতেও পারি নি, আবার ও জিনিস খেতেও পারি নি।... দ্যাখ দেখি, এমন ঘন দুধ নুন দিয়ে নষ্ট কচ্ছে।''

স্বামীজী অবশ্য ঠিকই ধরেছিলেন যে বিলিতি খাবার খেয়ে তাঁর গুরুভাইয়ের দুর্দশা যথেষ্ট। মুখ বদলানোর জন্যে এগ পোচ বা ওমলেট খাবার পরামর্শ দিলেন। মহেন্দ্রনাথ এই সুযোগে এগ পোচ তৈরির কায়দাকানুন তাঁর পাঠকদের জানিয়েছেন। তবে সব বিলিতি খাদ্যই যে অখাদ্য তা নয়। যেমন এগ পোচ, ওমলেট বা মাংসের তরকারি মহেন্দ্রনাথের মন্দ লাগেনি।

বিলিতি ফলের মধ্যে ''ইংরেজী চেরি খাইতে খুব সুস্বাদু।'' আর স্ট্রবেরি? গুডউইন স্ট্রবেরির বেজায় ভক্ত। মহেন্দ্রনাথকে তাঁর পরামর্শ, গুঁড়ো চিনিতে 'জুবড়ে' স্ট্রবেরি খেতে হয়। তাঁর কথায় বস্তুটি মুখে দিয়ে মহেন্দ্রনাথের মহা আক্ষেপ : ''হায়রে কপাল! যে জিব আম খায় সেই জিভ কিনা গুড়কামানী খাচ্ছে!''

আরও একটি অপছন্দের বিলিতি খাবারের কথা মহেন্দ্রনাথ বলেছেন। সেটি 'রুবার্ব'। স্বামীজীর ভক্ত স্টার্ডি ''রুবার্ব্ খাইতে বড় ভালবাসিতেন। ইহা একরকম ছোট ছোট নলের মতো ফাঁপা শিকড়, খাইতে টক ও মিষ্টি মিশ্রিত।... সেইগুলি একটি চীনেমাটির বাটির ভিতর রাখিয়া একখানি ময়দার রুটি দিয়া উনুনে গরম করে। ইহাকে চার্ট বলে, মাংস থাকিলে পাই বলে। আহার করিবার সময় উপরকার রুটিখানি কাটিয়া ভিতরকার সেই শিকড়গুলি খাইতে হয়। স্টার্ডি এই রুবার্ব্ খাইতে বড় ভালবাসিতেন কিন্তু অপরের তাহা খাইতে ভাল লাগিত না।''

এইসব ছবি থেকে বোঝা যায় বিলিতি খাবার এঁদের ধাতে বিশেষ সয়নি। তবু শরীররক্ষার্থে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তারই ফাঁকে কচুরির সঙ্গে কালো মরিচ দেওয়া আলুচচ্চড়ি, ভাতের সঙ্গে ওলন্দা কড়াইয়ের ডাল বানিয়ে পরমানন্দে এঁরা ভোজন করেছিলেন কেননা রাঁধুনির নাম বিবেকানন্দ। আবার উলটো ছবিও আছে যেখানে বিবেকানন্দের হাতের ওই খাবার খেয়ে বিদেশি মানুষেরা ঝালে অস্থির হয়ে বিষ বিষ বলে চিৎকার করেছেন। তার রোমাঞ্চকর উল্লেখ মহেন্দ্রনাথের লেখায় পাই। সে অবশ্য অন্য গল্প। ✠